সমকাল | শুক্রবার
২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ১৪ ফাল্গুন ১৪২২

samakal.editorial@gmail.com

সমকালের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে ড. মইদুল ইসলাম

একে অপরের সমানাধিকার মেনে নিতে হবে

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : অজয় দাশগুপ্ত

মইদুল ইসলাম কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ, দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি শাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন। বর্তমানে ভারতে সমাজবিজ্ঞান চর্চার অন্যতম পীঠস্থান সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেসে (কলকাতা) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক। তিনি প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ডিফিল গবেষণা সম্প্রতি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে প্রকাশিত। বইয়ের নাম লিমিটস অব ইসলামিজম : জামায়াত-এ-ইসলামী ইন কনটেম্পরারি ইন্ডিয়া অ্যান্ড বাংলাদেশ। সমকালের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন সমকালীন বিভিন্ন প্রসঙ্গে।

সমকাল : সহিষ্ণুতা ও অসহিষ্ণুতা প্রসঙ্গ দিয়েই শুরু করি...

মইদুল : ভারতের সংবিধানে এ দুটি শব্দ নেই। সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা, সমতা, গণতন্ত্র, মর্যাদা, অধিকার, শান্তি, প্রগতি, বন্টন, কল্যাণ প্রভৃতি প্রসঙ্গ। এর কারণও রয়েছে। সংবিধান প্রণেতারা বোকা ছিলেন না। ইংরেজিতে লেখা ভারতের সংবিধানে তারা 'টলারেন্স' (সহিষ্ণুতা) ও 'ইনটলারেন্স' (অসহিষ্ণুতা) শব্দগুলো কেন ব্যবহার করেননি? তারা মনে করেছেন, সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার সমান। সেখানে সহ্য করা বা না করার প্রশ্ন উঠবে না। বরং একে অপরের সমানাধিকার মেনে নিতে হবে। ইংল্যান্ডে সপ্তদশ শতাব্দীর উদারবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সেখানে 'টলারেশান আইন' বলবৎ হয়। 'সহিষ্ণুতা'র অর্থ দাঁড়ায় কেউ অন্য কাউকে সহ্য করছে। 'সহিষ্ণু' শব্দটি আপাতদৃষ্টিতে ভালো মনে হলেও সেটা একটা সমস্যাপূর্ণ শব্দ, যা দিয়ে সংখ্যাগুরুবাদ পরোক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়। সহিষ্ণুতা হলো 'সহিষ্ণু' ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর 'অপরকে' সহ্য করার নৈতিক মান। সেখানে সহিষ্ণু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মানদণ্ডে বিচার করা হয় অপরকে (যাকে সহ্য করা হচ্ছে)। সেখানে সহিষ্ণু ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মুখ্য আর সহিষ্ণুত ব্যক্তি-গোষ্ঠী গৌণ। আরেকটু গভীরে গিয়ে বলা যায়, 'বিভিন্ন ধর্মীয়, জাতিগত, ভাষাগত সংখ্যালঘুকে সহ্য করছি এই তাদের ভাগ্যি, আমাদের মহানুভবতা। ওদের মত, পথ, জীবনচর্যাকে সহ্য করতে নাও তো পারতাম!' তাই সহিষ্ণুতার পক্ষে উপদেশ ও বক্তৃতা হলো সহিষ্ণু ও সহিষ্ণুতের মধ্যে এক অসম বড় ভাই-ছোট ভাই জাতীয় সম্পর্ক। অন্যদিকে সম্মান, সম্ভ্রম বা মর্যাদা হলো সমতার সম্পর্ক। পাশ্চাত্যেও এটা আমরা দেখি। আসলে পাশ্চাত্যের উদারবাদের মধ্যে একদিকে সমানাধিকার আর অন্যদিকে সহিষ্ণুতা নামক নাগরিকদের মধ্যে এক অসম সম্পর্কের দ্বন্দ্ব রয়েছে। আমাদের দেশে পাশ্চাত্যের উদারবাদের অনুকরণ করতে গিয়ে একদিকে উদারতা; অন্যদিকে সংখ্যাগুরুতন্ত্রের দ্বন্দ্বও সামনে চলে এসেছে। গণতন্ত্রে সংখ্যালঘুর অধিকার স্বীকৃত। কোনো দেশে গণতন্ত্র কত সফল সেটা সংখ্যালঘুদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা থেকে স্পষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রের মূলকথাই হচ্ছে ভিন্নমত পোষণ করতে পারা, প্রতিবাদ করতে পারা। মতানৈক্য প্রকাশের সুযোগ থাকা। মতবিরোধ ভুলে ধরার সুযোগ থাকা। গণতন্ত্রে সবাই একমত হবেন না। তাই গণতন্ত্রের একটা মূল ভিত্তি হলো বহুত্ববাদ। তা না হলে গণতন্ত্রের পরিসর বাড়বে না। একে অপরকে বোঝা, জানা, আদান-প্রদান, আলাপচারিতা এবং ভিন্নমত ও পথকে সম্মান দেওয়ার প্রক্রিয়া হলো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। এখানে সহিষ্ণুতা বা সহ্য করার প্রশ্ন আসে কেন? গণতন্ত্র তো সংখ্যাতন্ত্র নয়। ভোট হচ্ছে গণতন্ত্রের একটা উপায়স্বরূপ দিক। প্রকৃত বা প্রায় সম্পূর্ণ দিক নয়। ভোট গণতন্ত্রে অপরিহার্য। ওটা থাকতেই হবে। কিন্তু মূল বিষয় হচ্ছে প্রতিবাদের পরিসর বাড়ানো ও ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা।

সমকাল : ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিষয়টি কীভাবে বলবেন?

মইদুল : পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল ধারার একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে। শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-মহিলা-বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলন গণতান্ত্রিক কাঠামোকে জোরদার করেছিল। বিভিন্ন বিষয়ে নাগরিক আন্দোলনও আমরা দেখতে পাই। অন্যদিকে আঞ্চলিক দাবিগুলো সামনে রেখে বাংলা বরাবরই দিল্লির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল। আরও অতীতে গেলে বোঝা যায়, উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদের দাপাদাপির তুলনায় এক সময় বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটেছিল। আবার বাংলায় মোগলরা সেভাবে সরাসরি শাসন কায়েম করতে পারেনি। গোঁড়া ইসলামী চিন্তার পরিবর্তে লোকায়ত সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে এক সমন্বয়বাদী সুফি চিন্তার প্রসার বাংলায় ঘটেছিল। আজও উত্তর ভারতের মতো জাতপাতভিত্তিক হিংসা বাংলায় প্রবল নয়। যদিও উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের ভেদাভেদ সুপ্ত আকারে বাংলায় অবশ্যই আছে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে তার কিছু আভাস পাওয়া যায়। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বাংলায় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক সংঘাত কম। ১৯৬৪ সালের পর পশ্চিমবঙ্গে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তেমন হয়নি। যদিও শ্রেণীগত ও পার্টিগত বিরোধ এখানে অনেক হয়েছে। তবে উদ্বেগের কারণও রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে মোট জনসংখ্যার ২৭ শতাংশ মুসলিম সংখ্যালঘু মানুষ। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমদের জনসংখ্যার নিরিখে অনুপাত কিছুটা বেড়েছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশের চিত্র ভিন্ন। তৎকালীন পূর্ববঙ্গে ১৯৪৭ সালে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী ছিল প্রায় ৩০ শতাংশ। এখন তা ৯ শতাংশে নেমে এসেছে। এবার উদ্বেগের জায়গাটা বলি। আগেই বলা হয়েছে, গণতন্ত্র মানে সংখ্যাতন্ত্র নয়। কি সংখ্যালঘু আর কি সংখ্যাগুরু, গণতন্ত্রে প্রত্যেকের সমানাধিকার থাকতে হবে। বাংলার দুই অংশের বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের বেশিরভাগ মানুষের দাবি আসলে এক। তাদের জীবনে বঞ্চনা আছে, রাষ্ট্রীয় উপেক্ষা আছে। সেটা বিবেচনা করতে হবে। তাদের অভিন্ন সমস্যাগুলো হলো নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উচ্চমূল্য, কম মজুরি, বেকারত্ব, দুর্নীতি, সরকারি অনিয়ম, অশিক্ষা ও অসুস্থতা। এই সমস্যাগুলো দূর করার জন্য যেমন কিছু সাময়িক ও জরুরি পদক্ষেপ চাই; আবার দীর্ঘমেয়াদি কিছু বলিষ্ঠ পদক্ষেপ কাম্য। সব ধর্মের অনুগামীদের মধ্যে যদিও বঞ্চিত রয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কিন্তু সংখ্যালঘু মুসলিমদের মধ্যে আর্থ-সামাজিক অনগ্রসরতা অত্যন্ত পরিস্ফুট।

২০০৬ সালের সাচার কমিটির প্রতিবেদন এবং ফেব্রুয়ারি (২০১৬) মাসে প্রকাশিত অ্যাসোসিয়েশন স্যাপ, গাইডেন্স গিল্ড ও নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের প্রতীচী ট্রাস্টের মিলিত প্রতিবেদনে পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমদের আর্থ-সামাজিক দুরবস্থার কথা বিশেষভাবে উল্লিখিত। এই রিপোর্ট কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমদের একেবারে সাম্প্রতিকতম চিত্র। বাম শাসনামলে রঙ্গনাথ মিশ্র কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ২০১০ সালে পশ্চিমবঙ্গে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যে যারা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণী তাদের জন্য সরকারি চাকরিতে ১০ শতাংশ সংরক্ষণনীতি চালু হয়। ২০১১ সালে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে তৃণমূল সরকার গঠিত হওয়ার পর রাজ্যে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর তালিকা আরেকটু দীর্ঘায়িত হয় এবং অন্তত খাতা-কলমে, অনেক বেশি সংখ্যার মানুষকে সংরক্ষণের আওতায় নিয়ে আসা হয়। এখন রাজ্য সরকারি চাকরি ও অনেক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই সংরক্ষণনীতি গ্রহণ করেছে। তারপরও মুসলিম সংখ্যালঘুদের চাকরির পরিস্থিতি হতাশাব্যঞ্জক। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী দাবি করলেন, মুসলমান উন্নয়নের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির নাকি ১০০ ভাগ কাজ হয়ে গেছে! সে কথা আদতে সত্যের অপলাপ। সাচার কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, সরকারি চাকরির উচ্চপদে মুসলিমদের অনুপাত মাত্র ৪ দশমিক ৭ শতাংশ ও সর্বমোট সরকারি চাকরিতে ২ দশমিক ১ শতাংশ। ২০০৭ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা ২৫-২৭ শতাংশ হওয়া সত্ত্বেও সরকারি চাকরিতে তাদের অংশ এখন মাত্র ৫ দশমিক ৭ শতাংশ। সম্প্রতি এ বিষয়ে এক গবেষক লিখেছেন, এ রকম শ্লথ গতিতে এগোলে 'জনসংখ্যার নিরিখে মুসলিমদের সরকারি চাকরিতে প্রতিনিধিত্ব সমতা-গুণাঙ্কে পৌঁছতে অন্তত ৬০ বছরেরও বেশি সময় লাগবে।' ওই গবেষকের প্রতিবেদনে এটাও পরিষ্কার, কলকাতা শহরে সরকারি কর্মী, পুলিশ ও পুরসভায় মুসলিমদের আনুপাতিক হার অনেক কম। এ অবস্থা বাম আমলের থেকে খুব আলাদা কিছু নয়। তবে বামপন্থিদের শাসনামলের প্রথম দশকে ভূমি সংস্কার হয়েছিল। যার ফলে অনেক মুসলিম পরিবারও জমি পেয়েছিল। বাম আমলের শেষের দশকে আরেক প্রস্থ বড় ধরনের ভূমি সংস্কার প্রয়োজন ছিল। তৃণমূল আমলে সেই প্রক্রিয়া প্রায় থেমে গেছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী মুসলিমদের মধ্যে চার ভাগের তিন ভাগই ভূমিহীন। তৃণমূল আমলে মাত্র ৩ শতাংশ মুসলিম জমির পাট্টা পেয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমদের মধ্যে প্রায় ৮৬ শতাংশ বাংলাভাষী আর প্রায় ৯ শতাংশ উর্দুভাষী। বাকিরা হিন্দি, সাঁওতালি, নেপালি ও ওড়িয়া বলে থাকেন। তৃণমূল সরকার উর্দুভাষী মুসলিমদের দিকে বাড়তি নজর দিচ্ছে ও বাঙালি মুসলিমরা বহু ক্ষেত্রে উপেক্ষিত– এ রকম অভিমত বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে আছে। গ্রামীণ মুসলিমরা যারা মূলত বাঙালি মুসলিম, তাদের অবস্থা দেখলেও বোঝা যায় উপেক্ষার চিত্র। গত ১৭ বছরে তৃণমূল হিন্দুত্ববাদী দল বিজেপির সঙ্গে একজোট হয়ে চারটি নির্বাচনে লড়েছিল। কেন্দ্রে বিজেপির সরকারেও তারা শামিল ছিল। এখন আবার ভোল পাল্টে মুসলিমদের ধর্মীয় পরিচিতিকে উস্কে দিয়ে ইফতার পার্টি আর মসজিদের ইমামদের মাসিক ভাতা দিয়ে বৃহত্তর মুসলিম জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে বঞ্চিত করে রাখছে। মুসলিমরা বহু ক্ষেত্রে ব্যাংক থেকে ঋণ পায় না। সব জায়গায় বাড়ি ভাড়া বা বাড়ি কিনতে তাদের অনেক অসুবিধা হয়। মুসলিম জনগোষ্ঠীর গণতান্ত্রিক ও আর্থ-সামাজিক দাবিগুলোকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম সংখ্যালঘুদের অবস্থা নিয়ে কিছু গবেষণা হচ্ছে। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের নিয়ে সে রকম কোনো কাজ হয় কি-না, জানা নেই। আগেই বলেছি, একটি দেশে গণতন্ত্র কী পর্যায়ে আছে তার গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হচ্ছে সংখ্যালঘুদের অবস্থা। জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্মীয়, সব ধরনের সংখ্যালঘুর কথাই আমি বলছি। নারীদের অবস্থাও আলোচনা করা দরকার। তাদের সক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা বিচার না করে গণতন্ত্রের মান বোঝা যাবে না এবং এ ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম মহিলাদের অবস্থা খুবই শোচনীয়।

সমকাল : ভারতের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

মইদুল : এখন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হিন্দুত্ববাদী দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) কেন্দ্রীয় সরকারে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে ক্ষমতায়। মূলত উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলো থেকে তারা ২০১৪ সালের সংসদ নির্বাচনে সমর্থন পেয়েছিল। কিন্তু দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে তারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল শক্তি। পশ্চিমবঙ্গেও বিজেপি দুর্বল। ২০১৪ সালের নির্বাচনে বিজেপি জেতার পরই সংঘ পরিবারের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তির ওপর নানাভাবে আক্রমণ করছে। উচ্চশিক্ষার পীঠস্থানে তারা বারবার হস্তক্ষেপ করছে। আশার কথা, এ নিয়ে ভারতের নাগরিক সমাজ ও সরকারবিরোধী শক্তি প্রতিবাদমুখর। কয়েক মাস আগে বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে যে রাজ্যগুলোতে নির্বাচন হবে তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু ও কেরলে বিজেপির সমর্থন একেবারেই কম। বাংলাদেশ সংলগ্ন আসামে বিজেপি সাম্প্রদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছে। তারা বলছে, বাংলাদেশ থেকে মুসলমানরা এসে হিন্দুদের সংখ্যালঘু করে ফেলছে। ওই দলটি আরও বলছে, হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা ভারতে এলে শরণার্থীর মর্যাদা পাবে, নাগরিকত্ব পাবে। কিন্তু মুসলমানরা এলে তারা অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত হবে। এখানে বলে রাখা ভালো, এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়ার প্রশ্ন মূলত অভিবাসনকেন্দ্রিক। সাম্প্রদায়িক ভাষার রঙে রঙিন 'শরণার্থী' বনাম 'অনুপ্রবেশকারীর' নয়। তাই বিজেপি অভিবাসন সংক্রান্ত নীতি সরিয়ে রেখে ঘোলা জলের রাজনীতির ছক কষছে।

সমকাল : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কীভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করবেন? বাংলাদেশের পরিস্থিতি ভারতে কতটা প্রভাব ফেলে?

মইদুল : ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ জনগণের বাংলাদেশ থেকে শেখার রয়েছে। বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের অন্যতম হলো জামায়াতে ইসলামী। তারা ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছিল ১২ শতাংশের একটু বেশি। ২০০১ ও ২০০৮ সালের নির্বাচনে তারা সীমিত জায়গায় ভোটে দাঁড়ায়। কারণ দেশজুড়ে তাদের সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল না এবং যথাক্রমে মাত্র ৪ দশমিক ২৮ শতাংশ ও ৪ দশমিক ৬০ শতাংশ ভোট পায়। ২০১৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যদি তারা অংশগ্রহণ করত, তাহলে তাদের জনসমর্থনের একটা সাম্প্রতিক হিসাব পাওয়া যেত। যাই হোক, ২০১৪ সালের উপজেলা নির্বাচন ও সাম্প্রতিক পৌরসভা নির্বাচনেও তারা তেমন সাড়া জাগানো ফল করেনি। এটাই বাস্তবতা, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ জামায়াতে ইসলামীকে ভোট দেয় না। ঘোষিতভাবে ধর্মভিত্তিক অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী সাফল্য তেমন নেই। তবে বিভিন্নভাবে সাময়িক উত্তেজনা তারা সৃষ্টি করে। ভারতে কিন্তু ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক শক্তির দুর্বলতার চিত্র নেই। বর্তমান লোকসভায় আরএসএসের মদদপুষ্ট বিজেপি ৩১ শতাংশ ভোট পেয়েই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়ে সরকার গঠন করেছে। আরএসএস ও জামায়াতে ইসলামীকে মৌলবাদী মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ বলা যায়। বাংলাদেশের আপামর সাধারণ মানুষ বরাবরই ধর্মীয় রাজনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অগ্রসর হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক শক্তি তেমন দাগ কাটতে পারেনি। এ বিষয়ে ভারতের অন্যান্য রাজ্য দুই বাংলার জনগণের অসাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে অবশ্যই শিক্ষা নিতে পারে। দুই বাংলার সাম্প্রতিক ইতিহাস বলছে, শ্রেণী ও ভাষার ভিত্তিতে রাজনীতি ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে বহুবার পরাস্ত করেছে। অন্যদিকে গণতান্ত্রিক রাজনীতি যে কোনো প্রকারের উগ্রবাদকেও মাথাচাড়া দিতে দেয়নি। সজাগ ও সচেতন সাধারণ মানুষই এ জন্য কৃতিত্বের প্রধান দাবিদার।

সমকাল : সাক্ষাৎকার প্রদানের জন্য ধন্যবাদ।

মইদুল : সমকাল পাঠকদের শুভেচ্ছা।